"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৩ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রিত সংখ্যার প্রকাশঃ জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / বৈদ্যুতিন সংখ্যাঃ এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

২৯ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই ভাদ্র, ১৪২৯ / 24.08.2022

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি–কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
জীবন	শ্রী অরবিন্দ
শ্রীঅরবিন্দকে যেমন দেখেছিলাম	শ্রী দিলীপকুমার রায়
ভক্ত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রী প্রণব ঘোষ
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মশিক্ষার স্থান : স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রী অমিয়কুমার মজুমদার
বৈদান্তিক শ্রীশঙ্করাচার্য	শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ
ন্যায়ের সূচনা	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website: https://www.parthasarathipatrika.com
Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

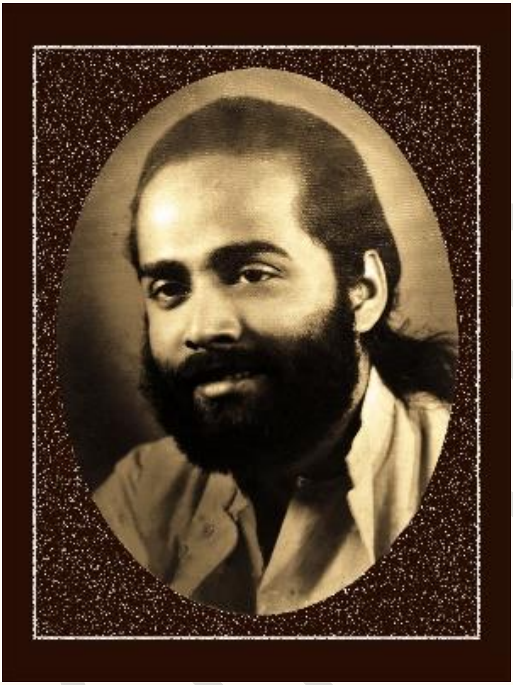

(10.03.1926 - 24.11.1986)

প্রীতি-কণা

“আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো ধর্ম, সেবা ও ত্যাগ। সেবা হবে প্রেম ও শ্রদ্ধার সাথে। ধর্ম-জীবন ও সেবা – এই দুটি দিয়ে গড়ে তুলতে হবে প্রথমে নিজের জীবন, তারপর নিজ নিজ সংসার, গোষ্ঠী ও সমাজ, দেশ। নিজের জীবনকে প্রথমে পবিত্র ও শুদ্ধ সেই সঙ্গে প্রেমময় করে তুলতে হবে।”

DON'T COPY

পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

অনেকদিন চিঠিপত্র ছাপান হয় না। এবার শারদীয়া সংখ্যায় (১৯৮৯) শ্রীপ্রীতিকুমারের কয়েকটি চিঠি প্রকাশের জন্য দেওয়া হোল। তাঁর ঐ ছোট ছোট চিঠিগুলি পড়লে জানা যাবে আমাদের প্রতি তাঁর কত সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কত অল্প বয়স থেকে আমাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, কতভাবে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

আজ মনে হয় তখন জীবনটা ছিল উচ্ছ্বাসে ভরা। দিনরাত শুধু হাউমাউ করতাম। আজকের মত এই নীরবতা যদি তখন থাকতো, জীবনে কিছু করতে পারতাম। তবু চেষ্টা করি মেনে চলবার। এগিয়ে যাবার। সাধ্য আর আমাদের কতটুকু। তাঁর সদা জাগ্রত দৃষ্টি আমার উপর থাকুক এইটাই প্রার্থনা।

7/21, Barada Basack Street,
Calcutta - 36.
29.10.1966.

অভিন্নহৃদয়েষু,

গতকাল তোমাদের পৌঁছানোর সংবাদ পেলাম। লক্ষ্মী সকালেই দু'বেলার রান্না করে দিচ্ছে। নির্মলাও বেশ সাহায্য করছে। কোন অসুবিধাই নেই। এবার আর চরণকে নিচ্ছিনা। অসম্ভব খরচ ও সংসারটিকে যাচ্ছেতাই করে দেয়। ওরা চরণকে পাঠাবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছিল। আমি না করে দিয়েছি।

হাজারিবাগ থেকে M.N. Chatterjee এসেছিলেন, কাল ফিরে যাবেন। তোমাদের বেড়াবার জন্য যদি গাড়ী দরকার হয় ওঁকে বললে উনি দিয়ে দেবেন। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি।

প্রদীপবাবুও কাল সকালে হাজারিবাগ রওনা হবেন। আমার এ অবস্থায় আর যাওয়া সম্ভব কি? আশেপাশে সব ঘুরে নেবে। অন্য ভাষা অন্য State হলে কি হবে, সকলকেই এক ভারতীয়, এক সংসার, এক পরিবার করে নিয়ে মিশতে হয়। তবেই বিমল আনন্দ ও শক্তির উপলব্ধি আসে। নিজেকে দেশ বিদেশে যত ছড়িয়ে দিতে পারবে, ততই ঈশ্বরের অস্তিত্বের রসাস্বাদ করা যায় নানাভাবে, নানাদিকে। ঈশ্বর এক হলেও তিনি বহু হয়ে তাঁর লীলার রসাস্বাদ

করেন। আমি ও তুমি এক, অথচ বহুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের রসাস্বাদ করছি এবং তাঁর লীলার সহায়তা করছি জীবনের প্রতি পদে। প্রতি স্তরে লক্ষ্য কোরো ঈশ্বরের কোমল ও প্রেমময় স্পর্শ আমাদের জীবনে আনে নূতন জীবনের স্বাদ। প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনে যত আ-ফোটা ফুল আছে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসে। জীবনকে সুখময় করে তুলতে হবে।

জগদীশ কাল ফিরে এসেছে রাত দশটায়। প্রথমে বলেছে রাস্তা ভুলে গেছিলো। অনেক জেরা করবার পর বললো ওর দেশের লোকের কাছে গিয়েছিলো। তাকে না পেয়ে ফিরে এসেছে। যাইহোক, ওকে আর রাখিনি। জামা কাপড় যা পরে এসেছিলো, তাই পরিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছি। যা টাকা দিয়েছিলাম, সব খরচ করে ফেলেছে। ওরা যদি পারে তবে যেন হাজারিবাগ থানায় একটু জানিয়ে রাখে। ভিতরে কি মতলব আছে কে জানে! যাইহোক, এখানকার জন্য চিন্তা কোর না।

আদর জেনো।

ইতি - তোমার প্রীতিকুমার

Baranagar, Cal - 36
1st Nov, 1966

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার 29.10. তারিখের চিঠি আজ পেলাম। বাবুকে মারধর কোর না। যুক্তির দ্বারা বুঝিয়ে দিও। ওকেও আনন্দে রাখবে। তোমার ভালো লাগছে জেনে আনন্দ হোল। আমার এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। বরং লক্ষ্মী ও নির্মলা, ওরা দুজনেই সব করে দিচ্ছে। আমাকে কোনও কাজ করতে হচ্ছে না। আশেপাশে সব ঘুরে দেখে নিও। বাবুকে চিঠি দিতে বোল। স্কুলের পড়া যেন কোন এক ফাঁকে করে রাখে।

বাবুকে আদর দিও। তুমি আমার আদর নিও।

ইতি - প্রীতিকুমার

02.11.66

অভিন্নহৃদয়েষু,

গতকাল বিকেলে তোমার Express চিঠি পেয়েছি। লোক পেলে নিয়ে আসবে। তোমার ও বাবুর যদি ভালো লাগে তবে ঁকালীপূজা পর্যন্ত থাকবে। আমার কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। লক্ষ্মী ও নির্মলা খুব কাজ করছে। মদনও করছে। তাছাড়া আমি বাড়িতেই বেশি সময় থাকি। কোনও অসুবিধা হয় নি। তোমরা সব জায়গা ভালো করে ঘুরে দেখে নাও। প্রদীপবাবু কি বলেছে ওসব দেখবার দরকার নেই। সবসময় যাওয়া হয়না। তাছাড়া বাবুর জন্য এসব বেশী করে দরকার। ও সাইকেল চড়া শিখেছে? ভালো কোরে যেন শেখে। টাকা দরকার হলে বোল। পাঠিয়ে দেব। ওদের সকলের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ হওয়া দরকার।

আদর জেনো।

ইতি - প্রীতিকুমার

পুঃ - প্রদীপবাবুর সঙ্গে আসবার জন্য ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ওরা যেমন যেমন পাঠাবে ও তোমার সুবিধে মত আসবে।

Baranagar
05.11.66

অভিন্নহৃদয়েষু,

গতরাত্রে ফিরে তোমার ৩টি চিঠি পেলাম। বাবু ও কুমুদের চিঠি পেলাম। আজ সকালে তোমার Call Book করেছিলাম। Line খারাপ থাকায় পাওয়া গেলো না। যদি প্রদীপবাবুর সঙ্গে আসতে চাও, চলে এস। যদি প্রদীপবাবু স্ব-ইচ্ছায় নিয়ে আসতে চান, তবেই। নচেৎ নয়। ওখান থেকে পাঠানকোট এক্সপ্রেসে চেপে এখানে সোজা দক্ষিনেশ্বরে নেমে পড়বে। যদি সঙ্গে লোক থাকে তবে সব দিক দিয়ে সুবিধে। পাঠানকোট সম্ভবতঃ হাজারিবাগ রোডে সকাল সাতটায় ছাড়ে। তোমাদের ভোরেই রওনা হতে হবে। এখানে বিকালে সাড়ে ৩টা অথবা ৪টায় পৌঁছায়। …… আমি আগে জানতে পারলে ষ্টেশনে থাকবো। যদি না জানতে পারি দক্ষিনেশ্বরে নামলে কোনও অসুবিধে হবে না। একটি রিক্সা করে চলে আসবে।

কুমুদ ও ব্রজেশ্বর বাবুকে বোলো আমি পরে চিঠি দিচ্ছি। তবে ওর

‘বাসের’ জন্য ঁমাকে জানাচ্ছি। অরুণের চাকরি হবে। বাবুকে আর পৃথক চিঠি দিলাম না। ওকে বোলো সাইকেল নিশ্চয়ই কিনে দেব। ওদের একদিন খাইয়ে দিও। এখন টাকা পাঠালে পাবে না। প্রদীপবাবুকে বলা ঠিক হবে না। ভুবনেশ্বর ও অরুণ ভদ্র ও মার্জিত। ওদের জীবনের দুঃখ ও ব্যথা বাদ দিলে দেখবে ওদের জীবনে সর্বদা আনন্দময় সত্বা বিরাজমান। ভুবনেশ্বর যুক্তিবাদী ও রুচিবান ছেলে।

আদর জেনো। বাবুকে আদর দিও।

ইতি - প্রীতিকুমার

বরানগর
৭/১১/১৯৬৬

অভিন্নহৃদয়েষু,

এইমাত্র তোমার Express চিঠি পেলাম। প্রদীপবাবুও এইমাত্র এলেন। সঙ্গে ভীমবাবু। তুমি ১২ তারিখ পর্যন্ত ওখানে থাকবে লিখেছ। আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে বাবুকে ঁকালীপূজায় কিছু বাজী কিনে দিও। ওদের সকলকে ঁকালীপূজার দিন খাওয়ানো যদি সম্ভব হয়, খাওয়াবে। এইসঙ্গে ৪০ টাকা পাঠালাম। লক্ষ্য রাখবে তোমাদের ওখানে থাকবার জন্য ওদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা। যদি তেমন বোঝ তবে চলে আসবে। মনে হয় ওরা যথেষ্ট যত্ন করছে ও করবে। প্রদীপবাবুর সঙ্গে আসতে হয়নি ভালই হয়েছে।

M.N. Chatterjee যদি গাড়ী না দিয়ে থাকেন তবে চাইবার দরকার নেই। যেটুকু দেখেছো বা ঘুরেছো তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের ঘোরাঘুরির জন্য ওরা যেন বিরক্ত বোধ না করেন।

বাবুকে আদর জানাবে। তুমি আমার আদর নিও।

ইতি - প্রীতিকুমার

বরানগর
১০/১১/১৯৬৬

অভিন্নহৃদয়েষু,

ঁমায়ের পূজার দিনে আশীর্বাদ জানাই তোমাকে ও বাবুকে। বাবুকে বাজী কিনে দিও। ভীমবাবুর কাছে চল্লিশ টাকা পাঠিয়েছি। নিশ্চয়ই

পেয়েছো। ওদের খাইয়ে দিও। একটি কথা মনে রেখো। আমি আদর্শ ও নীতিবাদী পুরুষ। জীবনে অর্থের জন্য হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক কারও কাছে হাত পাতিনি বা মাথা নীচু করিনি। যাদের কাছে তুমি গিয়েছ, তাঁদের কাছেও কোনদিন চার পয়সাও সাহায্য নিই নি বা অর্থের জন্য মাথা নত করিনি। তবে তারা ভক্তিভরে বা শ্রদ্ধাবশে প্রণাম করে দশ বিশ টাকা দিয়েছে, সেটি সাহায্য গ্রহণ করা নয়।

ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদীপবাবু বা আমাকে নিয়ে যে সব আলোচনা হয় তার মাঝে তুমি থেকো না।

তোমাদের ঘোরাঘুরির জন্য ওরা যেন বিরক্ত বোধ না করেন। তার থেকে বিরত থেকো।

ঁপূজার পর দিন আমি নিজে খাবার ব্যবস্থা করে নেব। পূজার দিন পারলে কালীবাড়ী গিয়ে মাকে দর্শন করে এস। বাবুকে বলবে মায়ের নিকট একমাত্র শক্তির জন্য প্রার্থনা করবে। সেইসঙ্গে থাকবে জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি। পুরুষাকারকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বলবান হতে হবে।

বাবুকে আমার আদর দিও। তুমি আমার আদর জেনো।

ইতি – প্রীতিকুমার

(** রচনাকাল – সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯)

* * *

“দূর ক’রে দাও যত আলস্য, দূর ক’রে দাও ইহলোক ও পরলোকে ভোগের বাসনা। আগুনে ঝাঁপ দাও আর মানুষকে ভগবানের দিকে নিয়ে এস।”

-- স্বামী বিবেকানন্দ

জীবন

শ্রী অরবিন্দ

অলোকসামান্যা তুমি, আনন্দ-দুহিতা,
পরম উল্লাসময়ী, প্রাণ!
উদার আকাশে ওড়ে, বন্ধন রহিতা,
অন্তহীন তব অভিযান।
তোমার ডানায় তুমি করিছ বহন
মহান গৌরব, পরিহাস,
অমর দেবত্ব আর নিষ্ঠুর মরণ,
সমভাবে বেদনা উল্লাস।
উদ্দাম আশ্লেষে কর আমারে গ্রহণ,
পরিত্যজি দুর্বল সংশয়,
অনবগুন্ঠিতা ভীমা, দাও পরশন,
অবশ শৈথিল্য কর জয়।
করিব সন্ধান আমি আনন্দ তোমার,
সয়ে নেব তোমার পীড়ন,
হোক তাহা কেশরীর নির্দয় হুঙ্কার,
বসন্তের মাধুরী সিঞ্চন।

আসুরিক বলে বিশ্ব করি অধিকার,
দেবসম ভুঞ্জিব ভুবন,
করিব মানবসম সংগ্রাম দুর্বার,
শিশুসম প্রমোদে মগন।
তোমার সকাশে আর বেশী যাচিব না,
ভাগ্য মোর গড়িতে না চাই,
রাজা কিংবা পরাভূত যাহাই করনা,
বাঁচি কিংবা সমুদ হারাই।
দীর্ণ বস্ত্রধারী আমি তথাপি ঈশ্বর,
দেবতা, যদিও ভূমে নত,
দলিত চরণে, জয়ী সবার উপর,
মৃত্যুহীন, যদিও নিহত।।

শ্রীঅরবিন্দকে যেমন দেখেছিলাম

শ্রী দিলীপকুমার রায়

একই মানুষ নানা দর্শকের চোখে নানা ভাবে ফুটে ওঠে। শ্রীঅরবিন্দকে আমি কী চোখে দেখেছিলাম সেই কথাই আজ বলব যদিও এ বর্ণনা আদৌ সহজ নয়, কেন না আমরা যেটুকু দেখি বা জানি তার মূলে থাকে অদেখা অজানা অনেক কিছু যা শিকড়ের মতন প্রচ্ছন্ন থেকে আমাদের দেখা বা জানাকে রসিয়ে রাঙ্গিয়ে ফলিয়ে তোলে। শ্রীঅরবিন্দকে আমি বরণ করেছিলাম দেবদূত গুরু বলে যিনি আমাকে নিয়ে যাবেন ইষ্টের চরণে। আমার যোগিবন্ধু কৃষ্ণপ্রেমের একটি প্রায়োক্তি মনে আসছেঃ গুরু এক হাতে ইষ্টের চরণ ধরেন অন্য হাতে শিষ্যের হাত। সাধনা মানে - গুরুর কাছে সেই দীক্ষা পাওয়া যার দিব্য বলে গুরু শিষ্যকে ক্রমশঃ কাছে টেনে আনেন ইষ্টের, শেষে শিষ্যকে ইষ্টের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ইষ্টের মধ্যে মিশে যান। এ-প্রসিদ্ধি বহুদিন থেকে চলে আসছে। সবাই হয়ত মানেন না। কিন্তু অনেকেই মানেন- তাদেরি দলে আমি নাম লিখিয়েছিলাম প্রথম থেকেই। বেশ মনে আছে- কথামৃতে যখন স্বামীজী বা রাখাল মহারাজের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণস্পর্শী লেনদেনের কথা পড়তাম বুকের মধ্যে কেমন করে উঠত, মনে হত- কই, এ-ধরণের সম্বন্ধ তো কোনো পরিচিত জাগতিক আদান প্রদানের মধ্যে মেলে না! পিতা মাতা স্বামী স্ত্রী ভাই বোন এ’ সব সম্বন্ধের মধ্যেই মাধুর্য থাকে ঠাকুর এ’ মাধুর্যের উৎস বলে। কিন্তু গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ আরও মধুর কেননা আরও অন্তরঙ্গ। আমার কিশোর মন চাইত এই ধরণের সম্বন্ধ পাতাতে কোনো বরণীয় গুরুর শরণ নিয়ে।

শ্রীম-র কাছে গিয়ে আরো প্রবল হল এ-অভীপ্সা - বিশেষ করে তাঁর গুরুভক্তি দেখে। আমি আমার পিতৃদেবকে গভীর ভক্তি করতাম, কিন্তু আমার পিতৃভক্তি শ্রীম-র গুরুভক্তির সামনে মনে হত অপলকা, পান্ডুর। একথা আমি অন্যত্র লিখেছি।

খোঁজ সুরু হল। এ ও সে নানা সাধুর চরণে গিয়ে দরবার করলাম। তাঁরা যা বললেন তার ভাবার্থঃ “সময় হলে পাবে যা চাইছ-‘ন ত্বরমানেন লভ্যঃ - হাঁকু-পাঁকুর কর্ম নয় সদ্‌গুরুর নাগাল পাওয়া।” মীরার একটি গানে আছে - হরিমিলনসে কঠিন হৈ মীরা অপনা সদ্‌গুরু পালা।” কিন্তু অবুঝ মন মানা মানৎ না - ফলে ছোটাছুটিই সার হল। এমন সময় কৃষ্ণপ্রেম আমাকে বলল

শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita পড়তে। বইটি পড়তেই বুকের তার বেজে উঠল। কে যেন কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললঃ ইনি ইনি ইনি–আর কেউ নয়–এঁর কাছে গেলেই বস্তুলাভ হবে অর্থাৎ কৃষ্ণ–মিলন। শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপাড়া ভাষণেও পড়লাম ঠাকুর তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন গীতার বাণীর ভাষ্য করে “সনাতন ধর্মের” প্রচার করতে।

ফলে তৃষ্ণা আরও গভীর হল, আমি লিখলাম শ্রীঅরবিন্দকে চিঠি। কিন্তু তিনি দেখা করতে রাজী হলেন না। তারপর তাঁকে লিখলাম প্রশ্ন করে–বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মত কী। উত্তরে তিনি লিখলেন (সুরেশ চক্রবর্তী হলেন মুখপাত্র) যে, যদি কোন আদর্শ না থাকে তাহলে যে কোন সুশীলাকে বিবাহ করতে পারি, তবে যদি কোনো আদর্শ থাকে তবে এমন স্ত্রীকে বরণ করা চাই যে সে আদর্শে সাড়া দিতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু লিখলেন কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্যটি ছিল–ভগবৎমিলন চাইলে বহু ভেবে চিন্তে তবে বধূবরণ করা দরকার, কেন না অবিদ্যা স্ত্রী হলে ভরাডুবির সম্ভাবনা।

তা তো হল, কিন্তু গুরু বিনা সিদ্ধি দুরূহ এ–জ্ঞান আমার ছিল। তাই ফের তাঁকে লিখলাম দর্শন চেয়ে। এবার– সম্ভবতঃ আমার আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখে–তিনি লিখে পাঠালেন–১৯২৪–এ পণ্ডিচেরিতে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

এ সাক্ষাতের কাহিনী আমি আমার তীর্থঙ্কর ও AMONG THE GREAT–এ বিশদ করেই লিখেছি। তার মর্ম এই যে, আমার সত্তা গান গেয়ে উঠল–যুগর্ষি শ্রী অরবিন্দই আমার গুরু আর কেউ নয়।”

কিন্তু আমার মনে তখনও দ্বিধা ছিল, তাই শ্রীঅরবিন্দ আমাকে দীক্ষা দিতে রাজী হলেন না। এসব কথাও লিখেছি আমি। তাই এ অধ্যায় টপকে যাই সরাসরি ১৯২৮সালে।

আমার চিত্তলোকে বিপ্লব ঘটে বাধা কেটে গেল, আমি ২২শে নভেম্বর ১৯২৮ সালে পন্ডিচেরী গিয়ে হাজির হলাম – শ্রীঅরবিন্দের টেলিগ্রাম পেয়েঃ ‘স্বাগতম্’।

◆

স্বামী যোগানন্দ

পূর্বাশ্রমের নাম যোগীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী। অল্প বয়সেই ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর তাঁকে ঈশ্বরকোটি বলে চিনতে পেরেছিলেন এবং গভীর মমতা নিয়ে তাঁকে শুধু অধ্যাত্মপথেই নয়, জগৎ সংসারের জটিল পথেও পরিচালিত করেছিলেন। যোগীন মহারাজ সঙ্কল্প করেছিলেন বিয়ে করবেন না, কিন্তু মা-বাবার চাপে সে সঙ্কল্প ভেঙে তাঁকে বিয়ে করতে হয়েছিল। তারপর তাঁর কি অনুশোচনা। কাম-কাঞ্চন ত্যাগী ঠাকুরের কাছে যেতেও তাঁর কত সঙ্কোচ। ঠাকুর তখন সুকৌশলে তাঁকে কাছে ডেকে নিয়ে সাহস দিয়ে বললেন, “বে করেছিস – তা কি হয়েছে? এই যে আমি বে করেছি। বে করেছিস, তা ভয় কি? (নিজের বুকে হাত রেখে) এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না। তোর যদি সংসারে থাকতে ইচ্ছে হয় তো তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে নিয়ে আসিস। তাকে এমন করে দেব যে সে তোর ধর্মপথে সহায় ছাড়া কখনও বিঘ্ন হবে না। আর যদি সংসার করতে না ইচ্ছে হয় তো বলিস, তোর মায়া মমতা সব খেয়ে ফেলব।” তারপর ঠাকুরই যোগীন মহারাজের একমাত্র আশ্রয়। আগে মাঝে মাঝে আসতেন, এখন নিয়মিত আসা শুরু করেন এবং কখন কখন রাত্রেও বাস করতে লাগলেন। ঠাকুরের পুণ্য সান্নিধ্যে এবং সার্থক পরিচালনায় তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে পরিণত হন। স্বামীজী বলতেন, “আমাদের ভেতর সর্বতোভাবে কেউ কামজিৎ থাকে তো সে যোগীন।”

কিভাবে কাম জয় করা যায় তা জানার জন্যে যোগীন মহারাজের খুবই কৌতূহল ছিল। ঠাকুরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, “খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে”। কথাটা তখন মনে ধরেনি। তিনি ভেবেছিলেন হঠযোগের মতো কিছু ক্রিয়া না করলে বোধহয় কাম যায় না। ঐ সময়ে পঞ্চবটীর কুটিরে থেকে একজন হঠযোগী নেতি ধৌতি ইত্যাদি ক্রিয়া দেখাতেন। একদিন যোগীন মহারাজ সেই হঠযোগীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন, উদ্দেশ্য তাঁর কাছ থেকে হঠযোগ শিখে কাম জয় করবেন। ঠাকুর হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যান এবং বলেন, “ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে

যাসনি। ওসব (হঠযোগের ক্রিয়া) শিখলে ও করলে শরীরের উপরেই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবে না।” তখনও মহারাজের ঠাকুরের কথায় পুরো বিশ্বাস হয়নি, তথাপি অগত্যা ঠাকুরের উপদেশ মতো হরিনাম করতে থাকেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ ফল লাভ করেন।

যোগীন মহারাজ মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাত কাটাতেন। একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখেন ঠাকুর বিছানায় নেই। তাঁর সন্দেহ হল ঠাকুর হয়ত নহবতে মায়ের কাছে গেছেন। তাঁর ধারণা সত্য না মিথ্যা তা যাচাই করার জন্যে তিনি বাইরে বেরিয়ে নহবতের দরজার দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরেই ঠাকুর পঞ্চবটীর দিক থেকে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?” ঠাকুরের সম্বন্ধে মনে অন্যায় সন্দেহ প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে তিনি লজ্জায় ভয়ে এতই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন যে কথা বলতে পারলেন না, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্তর্যামী ঠাকুরের তাঁর মনের কথা ধ্রতে বিলম্ব হয়নি। ভক্ত বৎসল ঠাকুর তাঁর দোষ গ্রহণ না করে বরং উৎসাহ দিয়ে বললেন, “বেশ বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।”

সংসার অনভিজ্ঞ যোগীন মহারাজকে ঠাকুর সহজ চলার পথ সম্পর্কেও উপদেশ দিতেন যাতে তিনি পদে পদে প্রবঞ্চিত না হন। একদিন যোগীন মহারাজ বাজার থেকে একখানা কড়া কিনে নিয়ে আসেন। বাড়িতে এসে দেখেন কড়া খানা ফাটা। এ কথা জেনে ঠাকুর তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেন, “ভক্ত হতে হবে বলে বোকা হতে হবে? দোকানী কি দোকান ফেঁদে ধর্ম করতে বসেছে, যে তুই তার কথায় বিশ্বাস করে কড়া খানা একবার না দেখেই নিয়ে চলে এলি? আর কখনও ওরূপ করিস না। কোন জিনিষ কিনতে হলে পাঁচ দোকান ঘুরে তার উচিত মূল্য জানবি, জিনিষ নেবার সময়ে বিশেষ করে পরীক্ষা করবি, আর যে-সব জিনিষের ফাউ পাওয়া যায় তার ফাউটা পর্যন্ত না নিয়ে চলে আসবি না।”

দেহ ত্যাগের পরও যোগীন মহারাজের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ পূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বিপদ আপদ থেকে তাঁকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করতেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে ট্রেনের মধ্যে যোগীন মহারাজের ভীষণ জ্বর হয়। জ্বরে তিনি এতই বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন যে বৃন্দাবনে তাঁকে কিভাবে নামানো হবে তাই সকলে চিন্তা করছিলেন। বেহুঁশ অবস্থায় যোগানন্দজী দেখেন ঠাকুর বসে আছেন এবং কাছেই রয়েছে নিকটাকৃতি জ্বরাসুর। সে বলছে, “তোকে দেখে

নিতুম, তা পারলুম না, তোর গুরু পরমহংসদেবের জন্য। তোকে এখনই ছেড়ে যেতে হচ্ছে। যাক্‌, এই বেটীকে (লাল কাপড় পরা এক দেবমূর্তি দেখিয়ে) রসগোল্লা দিস্‌।" ভোরেই মহারাজের জ্বর ছেড়ে যায়। এইভাবে দর্শন দিয়ে ঠাকুর সম্ভবত তাঁর প্রিয় সন্তানের মনে এই ধারণাই দৃঢ়বদ্ধ করতে চেয়েছিলেন যে তাঁর চিন্তার কারণ নেই, তিনি সর্বদাই তাঁকে রক্ষা করছেন।

বাবুরাম মহারাজ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দের) বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর বাবুরাম মহারাজকে নিজের অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং ঈশ্বরকোটি বলে চিনতে পেরেছিলেন। তখন বাবুরাম মাস্টার মশাইয়ের (কথামৃতকার মহেন্দ্র গুপ্তের) স্কুলের ছাত্র। মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখতে আসেন। এরপর যেদিন বাবুরামের মায়ের সঙ্গে ঠাকুরের দেখা হল তিনি তাঁর কাছে বললেন, "এই ছেলেটিকে তুমি আমাকে দাও।" এবং বাবুরাম জননীও সানন্দে সম্মতি জানিয়ে বললেন, "বাবা, আপনার কাছে বাবুরাম থাকবে, এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা।" এরপর থেকে ঠাকুরের আকর্ষণে বাবুরাম মহারাজ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে থাকেন এবং তাঁর প্রতি ঠাকুরের ভালবাসাও যেন ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ঘুমিয়ে পড়লে তিনি বাবুরামকে নিজের বিছানায় মশারীর মধ্যে শুইয়ে দিতেন, বাবুরাম কলকাতায় থাকলে দক্ষিণেশ্বর থেকে মিষ্টি নিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতেন।

ঠাকুরের ঘন ঘন ভাব হত। ভাবাবস্থায় ঠাকুর সকলের স্পর্শ সহ্য করতে পারতেন না। বাবুরাম মহারাজ ছিলেন শুদ্ধ আধার। ঠাকুর বলতেন, "ও নৈকষ্য কুলীন, ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ।" শুধু তাই নয় বাবুরামকে তিনি নিজের 'দরদী' বলেও উল্লেখ করেছিলেন। তাই ঠাকুর যেখানেই যেতেন বাবুরামকেও সঙ্গে নিতেন। ঠাকুর বাবুরাম মহারাজকে এতই ভালবাসতেন যে তিনি দু'চারদিন দক্ষিণেশ্বরে না এলে ঠাকুর অস্থির হয়ে পড়তেন এবং নিজেই কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। একবার দারুণ গরমের মধ্যে বেলা তিনটের সময় বলরাম-ভবনে এসে বললেন, "বলে ফেলেছি তিনটের সময় যাব, তাই আসছি, কিন্তু বড় ধূপ! ... ছোট নরেনের জন্য বাবুরামের জন্য এলাম। (কথামৃত, ৩/১৪৩পৃঃ)।

ঠাকুর বাবুরাম মহারাজকে ত্যাগ বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়ে গভীর তপস্যার পথে পরিচালিত করতেন। মহারাজ নিজেই বলেছেন, "...দরজা বন্ধ করে

আমাদের ত্যাগ বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেন – আবার বাইরে গিয়ে দেখে আসতেন, কোন বিষয়ী লোক এসেছে কিনা। কামিনী কাঞ্চনে যাতে বিতৃষ্ণা এসে যায়, সেইজন্য সে সব কথা উপমা দিয়ে বলতেন – যাতে আমাদের প্রাণে বিঁধে যায়।”

দেহত্যাগের পরও ঠাকুর নানাভাবে তাঁর প্রিয় সন্তান বাবুরামের প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করতেন। একবার গুরুভাইদের সঙ্গে কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় তিনি মঠ পরিত্যাগের সঙ্কল্প করেন। যেই ফটক পেরিয়ে বাইরে এসেছেন অমনি দেখলেন ঠাকুর তাঁর কাঁধের গামছাটা টেনে বলছেন, যাচ্ছ কোথায়, চাঁদ? আমায় ফেলে যাবে কোথায়? বলা বাহুল্য এরপর বাবুরাম মহারাজের আর মঠ ত্যাগ করা হয়নি।

অকালে যাতে বাবুরাম মহারাজের দেহপাত না হয়, সেজন্যে ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে সাবধান করেছিলেন। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ শেষে তিনি তখন সিরাজগঞ্জে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, “এখান থেকে মঠে ফিরে যাও, আর বেশী ঘুরাঘুরি করলে শরীর থাকবে না।” কিন্তু ভক্ত নীরদ সান্যালের নেত্রকোণার বাড়িতে না গেলে তাঁর মনে ব্যথা লাগে তাই তিনি ঠাকুরের নির্দেশ লঙ্ঘন করেন এবং পরিণামে কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে অচিরেই তাঁর দেহাবসান হয়।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে যাঁদের ঈশ্বরকোটি বলে নির্দেশ করেছিলেন নিত্য নিরঞ্জন ঘোষ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

প্রথম দিনেই ঠাকুর তাঁর এই অন্তরঙ্গ ভক্তটিকে চির পরিচিতের মতো গ্রহণ করেছিলেন। আলাপ আলোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত হয়, শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তথাপি ঠাকুর তাঁকে ছাড়তে চান না, বলেন, সন্ধ্যা হয়ে এল, আজ বাড়ি নাই বা গেলি; এখানেই আজ থাক।” মামার ভয়ে নিরঞ্জন ঠাকুরের কথায় সায় দিতে পারেননি। কিন্তু ঠাকুর যেন কিছুতেই ছাড়তে চান না, বলেন “ওরে এতটা যেতে কষ্ট হবে, যাসনি, থেকে যা।” তাতেও যখন কাজ হল না, ঠাকুর বললেন, একান্তই যাবি তো যা, কিন্তু আবার আসিস। ঠাকুরের এই ভালোবাসায় নিরঞ্জন অভিভূত হয়েছিলেন এবং দু’তিনদিন বাদে আবার দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির হয়েছিলেন। তাঁকে দেখা মাত্র ঠাকুর জড়িয়ে ধরে

আকুল স্বরে বলতে লাগলেন, “ওরে নিরঞ্জন, দিন যে যায় রে, তুই ভগবান লাভ করবি কবে? দিন যে চলে যায়, ভগবানকে লাভ না করলে সবই যে বৃথা হবে। তুই কবে তাঁকে লাভ করবি বল; কবে তাঁর পাদপদ্মে মন দিবি বল! আমি যে তাই ভেবে আকুল।” ঠাকুরের এই অহৈতুকী ভালবাসা দেখে নিরঞ্জন তো বিস্ময়ে হতবাক। পরের ঈশ্বর লাভের জন্য কি কেউ এমন ব্যাকুল হতে পারে। ঠাকুরের দিব্য প্রেমের আকর্ষণে নিরঞ্জন এবার শুধু এক রাত্রি নয়, পর পর তিনদিন দক্ষিণেশ্বরে থেকে যান।

এড়েদায় নিরঞ্জনের এক আত্মীয় বাড়ি ছিল। তিনি সেখানে মাঝে মাঝে যেতেন। নিরঞ্জন এড়েদায় গিয়েছেন অথচ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেননি জানতে পারলে ঠাকুর খুব দুঃখ পেতেন। একবার নিরঞ্জনকে বলেছিলেন, “তাই রাখাল বলছিল – তুই এড়েদায় এসেও দেখা করিস নাই কেন?”

নিরঞ্জনের সরলতা ঠাকুর শতমুখে প্রশংসা করতেন। মাষ্টার মশাইকে একদিন ঠাকুর বলেছিলেন, “দেখ, এই ছোকরাটি বড় সরল। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারী এসব থাকতে ভগবানকে পাওয়া যায় না।” নিরঞ্জন সম্পর্কে ঠাকুরের কথাবার্তা শুনলে মনে হত তিনি তাঁকে সাধারণ লোক মনে করতেন না। বলরাম ভবনে ভাবাবিষ্ট হয়ে ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, “আলেখ নিরঞ্জন! নিরঞ্জন, আয় বাপ – খারে, নেরে – কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করব? তুই আমার জন্যে দেহ ধারণ করে নবরূপে এসেছিস।” কাশীপুর উদ্যানবাটীতে একদিন নিরঞ্জনকে ডেকে বলেছিলেন, ‘তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।”

প্রয়োজনে নিরঞ্জনকে শুভাকাঙ্ক্ষী পিতার মতো শাসন করতেও ঠাকুর দ্বিধা করতেন না। নিরঞ্জন ছিলেন যেমন বলবান তেমনি উগ্রস্বভাব। একবার নৌকায় গঙ্গা পার হবার সময় কয়েকজনের মুখে ঠাকুরের নিন্দা শুনে তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে নৌকা ডুবিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি নিরস্ত হন। একথা শুনে ঠাকুর তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, “ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হতে আছে?”

ঠাকুরের স্বার্থলেশ শূন্য দিব্য ভালবাসা নিরঞ্জন প্রাণে প্রাণে অনুভব করতেন। একদিন ঠাকুরকে বলেছিলেন, “আজ্ঞে আগে ভালবাসা ছিল বটে, কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার জো নাই।”

স্বামী শিবানন্দ

স্বামী শিবানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম তারকনাথ ঘোষাল। ঠাকুরকে তিনি প্রথম দর্শন করেছিলেন গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের গৃহে, তবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় দক্ষিণেশ্বরেই। ঠাকুর তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন আপনজনের মতই। তারকনাথ অনুভব করেছিলেন ঠাকুরের চোখ থেকে যেন করুণা ঝরে পড়ছিল।

পরবর্তী দর্শনের সময় ঠাকুর তারকনাথকে কৃপা করেছিলেন। ভাবাবস্থায় নিজের শ্রীচরণ তারকনাথের বুকে তুলে দিয়েছিলেন এবং তার ফলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তারকনাথ ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি লাভ করেছিলেন। যখন জ্ঞান হয় তারকনাথ দেখেন ঠাকুর তাঁর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলছেন, “মা, নেমে এস, নেমে এস।” ঠাকুরের দিব্য স্পর্শে তারকনাথ সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে তিনি চিরমুক্ত আত্মা এবং ঠাকুর জগত কল্যাণে নরদেহে অবতীর্ণ স্বয়ং ঈশ্বর। ভক্ত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে অহৈতুকী কৃপায় ভক্তকে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি দান করেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দিন থেকেই তারকনাথের মনে হত ঠাকুর যেন ‘মা’। তারকনাথ বাল্যে গর্ভধারিণী মাকে হারিয়েছিলেন। মাতৃস্নেহের জন্যে তাঁর হৃদয়ের ক্ষুধা অন্তর্যামী ঠাকুর সম্ভবত জেনেছিলেন এবং তা পূরণের জন্যে তাঁর সঙ্গে মায়ের মতো ব্যবহার করতেন। কথামৃতকার শ্রীম একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়ে দেখেন ঠাকুর তারকনাথের চিবুক ধরে আদর করছেন। ঠাকুর স্বয়ং ঈশ্বর, তারকনাথ তা উপলব্ধিও করেছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের প্রাত্যহিক ব্যবহারের মধ্যে তেমন কোন দূরত্ব ছিল না, একে অপরের যেন কতই আপনার।

তারকনাথকে না ছুঁয়েই ঠাকুর একদিন তাঁর কুণ্ডলিনী জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তারকনাথ পঞ্চবটীতে ধ্যান করছিলেন, দেখলেন ঠাকুর ঝাউতলার দিক থেকে আসছেন। অমনি তাঁর হুহু করে কান্না পেল, বুকের ভিতর গুড় গুড় করতে লাগল এবং শরীর কাঁপতে শুরু করল।

ঠাকুরের কাছে যারা আসে বা থাকে তাঁদের অনেকের ভাবসমাধি হয় দেখে তারকনাথও ঠাকুরকে ভাবসমাধির জন্যে ধরেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, “হবে রে হবে – এত উতলা হচ্ছিস কেন? মা কৃপা করে সময়ে সব দেবেন। তবে তোর মূর্তিদর্শন এখন হবে না, পরে হবে। তোর ঘর আলাদা।” তারপর ঠাকুর একদিন নিজের আঙ্গুল দিয়ে তারকনাথের জিভে কি যেন লিখে দেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়। অনেকক্ষণ পরে

বুকে হাত বুলিয়ে ঠাকুরই তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিলেন। তারপর মিষ্টি খেতে দিয়ে সাধন সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তারকনাথ যখন ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন তখন তিনি বিবাহিত। ধর্ম পত্নীর প্রতি তাঁর কর্তব্য আছে, অথচ সংসারে তাঁর আদৌ মন ছিল না। একদিন সুযোগ বুঝে তিনি ঠাকুরকে সব কথা খুলে বলতেই ঠাকুর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, “ভয় কিরে – আমি আছি। স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখাশুনো করতে হবে বৈকি! একটু ধৈর্য্য ধর মা সব ঠিক করে দেবেন। বাড়িতে মাঝে মাঝে যাবি, আর যেমন বলে দিচ্ছি তেমনটি করবি – তাঁর কৃপায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না।” তারপর তাঁর বুকে ও মাথায় হাত দিয়ে খুব আশীর্বাদ করেছিলেন। ঠাকুরের এই অমোঘ আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়নি। একদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে স্বামীজীকে বলেছিলেন, “ঠাকুর আমার ভেতর এমন শক্তি সঞ্চার করেছিলেন যে, তার বলে আমিও কাম জয় করতে পেরেছি। তাঁর কৃপায় সবই সম্ভব।” একথা শুনে স্বামীজী সশ্রদ্ধভাবে বলেছিলেন, “তা হলে তো আপনি মহাপুরুষ।” সেই থেকে তিনি রামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে ‘মহাপুরুষ মহারাজ’ নামে খ্যাত হন।

স্বামী সারদানন্দ

অন্যান্য ভক্তদের মতো শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ঠাকুরের সপ্রেম ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি সুযোগ পেলেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে হাজির হতেন এবং কখন কখন রাত্রে থেকে যেতেন। এই সব ভক্ত সন্তানেরা কিভাবে কত দিনে ঈশ্বর লাভ করবে, সেই ছিল ঠাকুরের একমাত্র চিন্তা। গভীর রাত্রে ঘুমন্ত শরৎকে জাগিয়ে দিয়ে পঞ্চবটী বেলতলা অথবা শ্রীশ্রীভবতারিণীর নাটমন্দিরে ধ্যান করতে পাঠিয়ে দিতেন।

শরৎচন্দ্র যাতে সঠিক আদর্শ অনুসরণ করে চলেন, সে দিকেও ঠাকুরের দৃষ্টি ছিল। একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরটিতে বসে ভক্ত সঙ্গে গণেশের অনুপম চরিত্র আলোচনা করছিলেন। গণেশের মাতৃভক্তির কথা শুনে শরৎচন্দ্র বলে ওঠেন, “আমি গণেশের চরিত্র পছন্দ করি, তিনিই আমার জীবনের আদর্শ।” ঠাকুর তাঁকে সংশোধন করে বললেন, না, তোমার আদর্শ গণেশ নন, তোমার আদর্শ শিব - শিবের গুণরাজি তোমাতে বিদ্যমান।” সাধক জীবনের প্রারম্ভে

নির্ভুল আদর্শের সন্ধান লাভ করে শরৎচন্দ্র পরবর্তী জীবনে শিবকল্প মহাপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন।

প্রথম প্রথম শরৎচন্দ্রের ভালো ধ্যান হত না। একদিন সে কথা তিনি ঠাকুরকে জানিয়েছিলেন। নিজের তর্জনীর নখাগ্র দিয়ে শরৎচন্দ্রের ভ্রূ স্পর্শ করে তিনি তাঁকে সেখানে মন স্থির করতে বলেন। বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্র সে নির্দেশ পালন করেন এবং তাঁর মন নিবাত নিষ্কম্প দীপ শিখার ন্যায় স্থির হয়ে যায়। কাশীপুর শ্মশানে অথবা দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতে যে কত রাত ধ্যানে তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। পরবর্তী কালে তাঁর ধ্যান গম্ভীর দিব্যরূপ যেই দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে।

কল্পতরু হওয়ার সময় ছাড়াও ঠাকুর অনেকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। একদিন ঠাকুর শরৎচন্দ্রকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তুই যে কিছু চাইলি না?” শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, “কি আর চাইব? আমি যেন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করি – এই করে দিন।।” ঠাকুর বলেছিলেন, “ও যে শেষকালের কথা রে।” শরৎচন্দ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন, “তা আমি জানি মশাই।” তখন ঠাকুর তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, ‘তা তোর হবে’। ঠাকুর সন্তানের আকুল প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে শরৎ মহারাজ এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, “তিনি যা বলেছিলেন, এখন তাঁর কৃপায় সেটা বেশ অনুভব করছি।”

শরৎচন্দ্র ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতার ঔষধের ব্যবসা ছিল। স্বভাবতই তাঁর ইচ্ছা শরৎ কলেজে পড়াশুনা করে ডাক্তার হন। শরৎচন্দ্র মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তিও হয়েছিলেন কিন্তু ভক্তের প্রকৃত মঙ্গল চিন্তা করে ঠাকুর সব হিসাবে গোলমাল করে দিলেন। একদিন তিনি গম্ভীর মুখে শরৎকে বললেন, “দ্যাখ, তুই ডাক্তার হলে কিন্তু তোর হাতে খেতে পারব না।” ঠাকুরের জন্যে শরৎ বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে যেতেন, দিদির রান্না তরকারী খেয়ে ঠাকুর কত প্রশংসা করতেন। ঠাকুর আর তাঁর আনা খাবার খাবেন না শুনে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি স্থির করলেন তিনি বরং ডাক্তারী পড়া বন্ধ করবেন, তথাপি ঠাকুরের কাছ থেকে সরে যাবেন না। সবই ঠাকুরের কৃপা। ডাক্তারী পড়লে শরৎচন্দ্র হয়ত একজন বড় ডাক্তার হতেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অন্যতম জ্যোতিষ্ক স্বামী সারদানন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না।

DONT COPY

শরৎচন্দ্রের আধ্যাত্মিক শিক্ষা যাতে সম্পূর্ণ হয়, সেদিকে ঠাকুরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শ্যামপুকুরে গলরোগে পীড়িত অবস্থায়ও তিনি শরৎকে নানা আসন ও মুদ্রা দেখিয়ে দিতেন। আসন দেখিয়ে দিতে গিয়ে ঠাকুর সমাধিতে ডুবে যান এবং বায়ু উপরে উঠে যাওয়ায় গলায় আঘাত লাগে। এর ফলে ঠাকুরের গলার ব্যথা বাড়ে। ঠাকুরের এই বেদনা বৃদ্ধির জন্যে শরৎচন্দ্র নিজেকেই অপরাধী মনে করেন এবং সকাতরে ঠাকুরকে বলতে থাকেন, “তবে কেন আপনি এসব আমাকে দেখাতে গেলেন?” ভক্ত বৎসল ঠাকুর আর কি উত্তর দেবেন। শুধু বললেন, “তোদের এক আধটুকু না দেখিয়ে থাকতে পারি কই!” ঠাকুরের এই ভালোবাসায় শরতের চোখে জল এসে যায়।

দেহত্যাগের পরও ঠাকুরের ভক্ত বাৎসল্যে ভাঁটা পড়েনি। কয়েকদিন কেদারের পথে অনাহারে অর্ধাহারে হাঁটার পর শরৎ মহারাজ ঠাকুরকে স্মরণ করে মনে মনে বললেন – “এই বুড়ো কেদারে যদি গরম গরম লুচি হালুয়া খেতে পাই তাহলে বুঝবো ঠাকুর সত্যই আছেন।” একটু বাদে বাজারের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তাঁর কানে এলো “এ মহাত্মা! এ মহাত্মা!” পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলেন একজন দোকানী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কাছে যেতেই সে কিছু গরম লুচি ও হালুয়া এবং একবাটি জল দিয়ে আহার করতে বলল। শরৎ মহারাজের বুঝতে অসুবিধা হল না যে এ ঠাকুরেরই দান। ঠাকুর চোখের আড়ালে থাকলেও যে সর্বদা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন এ বিশ্বাস তাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গেল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

শশিভূষণ চক্রবর্তীর সন্ন্যাস নাম স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। শরৎ মহারাজ ও শশী মহারাজ সম্পর্কে জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাই। দুজনে একত্রে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন এবং দুজনেই ঠাকুরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

কলেজের ছুটি থাকলেই শশী দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং ঠাকুরের কথামৃত পান করতেন। ঠাকুরও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করতেন।

একদিন কিসের সন্ধানে যেন শশী ঠাকুরের ঘর পার হয়ে যাচ্ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে ডেকে বললেন, “তুই যাকে চাস – সে এই, সে এই, সে এই।” শশীর দৃষ্টি খুলে গেল। তিনি বুঝলেন তাঁকে জানলেই সব জানা যাবে। কৃপাময় ঠাকুর এইভাবে প্রিয় সন্তানকে তাঁর জীবনের ধ্রুবতারার সন্ধান জানিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর একদিনের জন্যও শশী মহারাজের দৃষ্টিভ্রম হয়নি।

শরৎ ও শশী মহারাজের সঙ্গে ঠাকুরের অলৌকিক সম্বন্ধ ছিল। ঠাকুর ওদের ঋষিকৃষ্ণের (অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের) দলে দেখেছিলেন। ঠাকুর আদর করে শশীকে দক্ষিণেশ্বরে থাকতে বলতেন। প্রথম প্রথম তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব হত না তবে ঠাকুরের প্রতি ভালবাসার কোন কমতি ছিল না। ঠাকুর বরফ খেতে ভালবাসতেন। শশী গরমকালে গামছায় জড়িয়ে বরফ এনেছিলেন। তাঁর ক্লান্ত ঘর্মাক্ত চেহারা দেখে ঠাকুর ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিলেন, আহা, তোর বড় কষ্ট হয়েছে। দ্যাখ, যার হাতে জল গলে না, লোকে তাকে কৃপণ বলে, কিন্তু আমি দেখছি তুই কৃপণ নোস, তুই দাতা।”

ঠাকুর এইভাবেই ধীরে ধীরে শশীর মধ্যে এই ভালবাসা সঞ্চার করছিলেন। ঠাকুরের স্বার্থলেশ শূন্য নীরব ভালবাসারই প্রতিধ্বনি হচ্ছিল শশী মহারাজের মধ্যে। ঠাকুর যখন শ্যামপুকুরে চিকিৎসার জন্যে অবস্থান করেছেন, রাত্রিকালে সেবার জন্যে লোকাভাব দেখা দিয়েছে, শশী ঠাকুরের সেবার জন্যে সেখানে অবস্থান করতে দ্বিধা করলেন না, এমন কি আহারের জন্যে বাড়িতে যাওয়াও বন্ধ করে দিলেন। নাওয়া খাওয়া ভুলে সর্বক্ষণই ঠাকুরের সেবায় মগ্ন থাকতেন। ঠাকুরই তাঁকে নাওয়া খাওয়ার জন্যে তাগাদা দিয়ে বলতেন, “নেয়ে খেয়ে নাও, আমি এখন ভাল আছি, আমার এখন কোন দরকার নেই, খেয়ে এস।” এমন বহুবার হয়েছে শশী ঠাকুরকে অবিরাম বাতাস করে চলেছেন দেখে ঠাকুরই তাঁর হাত থেকে পাখাখানা নিয়ে লাটুকে দিয়েছেন। দেহত্যাগের আগে ঠাকুর শশী মহারাজকে বলেছিলেন, “দ্যাখ, তোরা এই সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস। তোরা যদি বলিস তা হলে একবার সেখানে দেখে আসি।”

ঠাকুর ও শশী মহারাজের মধ্যে ভক্তি ও প্রেমের নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। ঠাকুরের দেহ গেলেও শশী মহারাজ কখনও ভাবতেন না ঠাকুরের দেহ নেই, আবার শশী মহারাজ অভিমান করলে ঠাকুর তাঁকে আশ্বস্ত করতে বিলম্ব করতেন না। বরানগর ও আলমবাজার মঠে ঠাকুর পূজার সমস্ত দায়িত্ব ছিল শশী মহারাজের উপর। সেই সেবার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবার জো ছিল না। ভোরে উঠে দামের উল্টো দিক দিয়ে দায়ের উল্টো দিক দিয়ে ঠাকুরের দাঁতন থেতো করে দিতেন, আবার নিজের গরম লাগলে ঠাকুরকে বাতাস করতেন। মাদ্রাজ মঠে অর্থাভাবে একদিন ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঠাকুরের প্রতি অভিমানে তখন তিনি ক্ষুব্ধ। ঠাকুরের উদ্দেশ্যে মনে মনে বললেন, “পরীক্ষা হচ্ছে? আমি তোমায় সমুদ্রের তীর থেকে বালি এনে ভোগ দেব এবং তাই প্রসাদ পাব। পেট নিতে না চায় আঙ্গুল দিয়ে ঠেলে সে প্রসাদ গলায় ঢোকাব।” ভক্ত

সন্তানের এই ক্ষোভ অভিমান দূর করতে ঠাকুর দেরী করলেন না। অচিরেই দরজায় করাঘাত শোনা গেল। দরজা খুলে শশী মহারাজ দেখলেন ঠাকুরের ভোগের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে একজন ভক্ত উপস্থিত।

শশী মহারাজ মুহূর্তের জন্যও ভুলতেন না যে তিনি যন্ত্র এবং ঠাকুর যন্ত্রী। কোন ভক্ত তাঁর সুখ্যাতি করলে তিনি বলতেন, “এই শরীরটা তো একটা যন্ত্র মাত্র, তাও আবার অচেতন, আর যন্ত্রীর জন্যই তো যন্ত্র, যন্ত্রীকে বাদ দিলে তো তার থাকা না থাকা দুই ই সমান। মনে কর, একটা কলম যদি বলে, আমি শত শত চিঠি লিখেছি তবে সত্যিই কি সে তাই করেছে? সে তো কিছু লেখেনি, লিখেছে সেই ব্যক্তি যে তাকে ধরে আছে।”

দাস্যভক্তির উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি শশী মহারাজের দেহত্যাগের আগে স্বয়ং ঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীকে সঙ্গে করে তাঁকে নিতে এসেছিলেন। ঠাকুরের সূক্ষ্ম আবির্ভাবের দুদিন বাদেই রামকৃষ্ণ গত প্রাণ এই মহাপুরুষের তিরোভাব ঘটে।

* * *

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মশিক্ষার স্থান : স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রী অমিয়কুমার মজুমদার

ভারতবর্ষ যেহেতু নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ (সেক্যুলার) রাষ্ট্ররূপে আত্ম-পরিচয় দিয়েছে সেইজন্য এই রাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলবে না – আজ এই জাতীয় সমালোচনা অনেক শিক্ষাব্রতীর কণ্ঠেই শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মত সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন ধর্মই হচ্ছে শিক্ষার কেন্দ্রগত সত্য এবং সেক্যুলার বা ব্যবহারিক শিক্ষাও ধর্মের মাধ্যমে দিতে হবে।

স্বামীজীর উক্তি বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন যে, আধুনিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলে কিনা এবং যদি চলে তাহলে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিটা কি হবে। স্বামীজী ‘শিক্ষা’ ও ‘ধর্ম’ দুটি শব্দকে প্রায় সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। মানুষের অন্তর্নিহিত ভাগবত শক্তির বিকাশের নাম

ধর্ম আর মানুষের অন্তর্নিহিত অখণ্ডতা বা পরিপূর্ণতার বিকাশের নাম শিক্ষা। কাজেই দেখা যাচ্ছে স্বামীজী ধর্ম ও শিক্ষা সমার্থক শব্দ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যখন তিনি বলেছেন ধর্ম হচ্ছে শিক্ষার মর্মবাণী তখন তিনি বিশেষ কোন ধর্ম সম্প্রদায় বা বিশেষ কোন ধর্মমতের কথা বলেন নি। ধর্ম হচ্ছে সেই শক্তি যা মানুষকে অভয় দেয় এবং মানুষ ভয়শূন্য হতে পারে তখনই যখন সে উপলব্ধি করে যে তার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে একটি অখণ্ড অবিনশ্বর চৈতন্যশক্তি বিরাজ করছে। এই চৈতন্যশক্তি মানুষের সত্তার মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে, তাকে উদ্বুদ্ধ করাই ধর্মের কাজ। এই শক্তির উদ্বোধন একটি ধরা-বাঁধা পথে হয় না, হতে পারে না, কারণ মানুষের স্বভাবের মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য। তাই বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে মানুষ তার লক্ষ্যে উপনীত হয়। এই পথগুলি হচ্ছে যোগের পথ। বিবেকানন্দ বলছেন যে, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ এই চারটি পথের যে কোনও একটি অথবা চারটিই সাধনমার্গ রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শাস্ত্রে দুরকম বিদ্যার কথা বলা হয়েছে, পরা ও অপরা। আত্মজ্ঞান হচ্ছে পরা বিদ্যা, যে জ্ঞান লাভ করলে মুক্তি হয়। আমি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন - এই প্রতীতি হয়, সেইটিই পরা বিদ্যা। এছাড়া অন্যসব বিদ্যাই অপরা বিদ্যা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ শাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। অপরা বিদ্যাও ধর্মের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে এই কথা স্বামীজী বারবার বলেছেন। এই কথা বেদান্ত ও উপনিষদে বলা হয়েছে। বৈদান্তিক ধর্ম আশা ও শক্তির ধর্ম। এই ধর্ম মানুষকে নিষ্ক্রিয় করার পরিবর্তে সক্রিয় করে। খর্ব, খিন্ন করার পরিবর্তে সাহসী করে এবং সে যে ‘অমৃতের পুত্র’ এই সত্যকে বারংবার ঘোষণা করে।

স্বামীজী ভারতবাসীর জন্যে যে শিক্ষার সুপারিশ করেছেন তা হচ্ছে মানুষ গড়ার শিক্ষা, চরিত্র গঠনের শিক্ষা, জীবনোপযোগী শিক্ষা। যে শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত নয়, যা মানুষকে জীবন সংগ্রামে জয়লাভে সহায়তা করে না, সে শিক্ষা অসার্থক। এই শিক্ষার জন্যই ধর্ম অপরিহার্য, কারণ ধর্ম মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস জাগায়, তাকে ভয়শূন্য করে। ধর্মের সত্য নিছক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত নয়। শুধু পূজা-পার্বণ, শুধু শাস্ত্র আর তার ভাষ্যের মধ্যে ধর্মের সার সত্য নেই।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই একটা মহৎ সত্য লুকিয়ে আছে; এই সত্যটি হোল মানুষের সঙ্গে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অভিন্নতা। এই সত্য অনবরত বিকাশ লাভ করতে চাইছে। এই বিকাশের নামই ধর্ম। আমরা যখন আত্মবিশ্লেষণ করি

DRAFT COPY

আমাদের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য অনুভব করি। আমরা অনুভব করি যে শরীর ও মন ছাড়া আমাদের ভিতর আর একটি সত্তা বিরাজ করছে। সেটি আত্মা। শরীর ও মন পরাধীন; কিন্তু আমাদের আত্মা স্বাধীন সত্তা। আত্মার অস্তিত্বের জন্যই আমাদের ভিতর থেকে মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠছে; কারণ আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব। আমরা স্বরূপত মুক্ত বলেই জগতকে সৎ ও পূর্ণ করে তুলবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। আমরা বিশ্বাস করি যে আমার ভবিষ্যৎ আমিই সৃষ্টি করছি। বর্তমানে আমার যে প্রকৃতি তা আমার নিজেরই সৃষ্টি। ইচ্ছা করলে আমি আমার নিজের সত্তাকে ভেঙে নতুন করে গড়তে পারি। এই অসাধ্য সাধন করবার ক্ষমতা আমি ধর্মবোধ থেকেই পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে তারা আসলে পরস্পর বিরোধী নয়। আসলে, প্রত্যেক ধর্মই সত্যের এক একটি প্রকাশ; সেই একই সত্যকে প্রকাশ করবার এক একটি ভাষা মাত্র।

আধ্যাত্মিকতা আমার স্বভাব; আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। আমি দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নই। আমি অনন্তচৈতন্যস্বরূপ। এটাই ধর্মের মূল কথা। এখন প্রশ্ন হোলঃ এই ধর্মের সত্য শিক্ষার মাধ্যমে কি অনুভব করা যায়? প্রচলিত অর্থে শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মের তত্ত্বগুলি জানা যেতে পারে, জগতের সাধক, যোগী ও তাপসদের মতামত জানা যেতে পারে; কিন্তু আমার মধ্যে যে চৈতন্যশক্তি প্রচ্ছন্ন আছে তার উদ্বোধন হবে কি ভাবে? শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন– পঞ্জিকায় লেখা আছে অমুক তিথিতে এতটা জল হবে, কিন্তু পঞ্জিকার পাতা নিংড়ালে তো আর সে জল পাওয়া যাবে না; ঠিক সেই রকম, আমার অন্তর্নিহিত চৈতন্যশক্তিকে উপলব্ধি করতে হলে আমার নিজের সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনার পথে ধর্মগ্রন্থপাঠ, উপাসনা প্রভৃতি সহায়তা করতে পারে কিন্তু সেগুলি ধর্ম নয়।

এই আলোচনা থেকে এ’ কথাটি পরিস্ফুট হচ্ছে যে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি যে অর্থে শিক্ষার বিষয়বস্তু, ধর্ম সে অর্থে শিক্ষার বিষয়বস্তু নয়। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা দিয়ে মানুষের ধর্মবোধকে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। শিক্ষকের আচার আচরণের মধ্যে যদি পবিত্রতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ত্যাগ ও সেবার ভাব থাকে তবেই তিনি তাঁর ছাত্রকে ধর্মের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রে দুটো কথা আছে; চর্চা আর চর্যা। আচার্য তিনিই যাঁর আচরণের মধ্যে জীবনের আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে। শুধু চর্চার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে

জানা যায় না, ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি সূত্র এবং তথ্য মাত্র জানা যায়। সেইজন্য প্রয়োজন চর্যার।

কোন কোন শিক্ষাবিদ বলেছেন যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রত্যহ সকল ধর্মের সার কথাগুলি সংকলন করে শোনান দরকার, কারণ এইভাবে তারা ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হবে। এই উক্তির মধ্যে সত্যতা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এটি ধর্মশিক্ষার প্রকৃষ্ট পথ নয়। ধর্ম আমার মহিমা ও মর্যাদা সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করে দেয়, আমাকে ত্যাগ ও সেবার পথে চলতে সহায়তা করে, আমাকে পবিত্র, সত্যনিষ্ঠ ও সাহসী হতে শেখায়। এই হল ধর্মের কাজ। ধর্ম আমাকে বলে তুমি এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, কারণ সম্প্রসারণই জীবন, সংকোচন মানে মৃত্যু। কাজেই প্রত্যেক ছাত্র–ছাত্রীই যে উপায়ে এইভাবে উদ্বুদ্ধ হবে সেটাই ধর্মশিক্ষা। এই উপায় কোন ধরাবাঁধা, ছক–কাটা উপায় নয়। মানুষের রুচি–বৈচিত্র্য, স্বভাব ও মনোবৃত্তি অনুসারে এই পথ ভিন্ন হতে বাধ্য। সেক্যুলার রাষ্ট্রে এই ধর্মশিক্ষার স্থান অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কারণ, যে রাষ্ট্রের নাগরিক হীনবীর্য, ভীরু, শঠ ও দুর্বল, সে কোন মতেই শিক্ষিত পদবাচ্য হতে পারে না। আমাদের দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় আমরা সঙ্কল্প করেছি যে সাম্য, ন্যায়, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি আদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখব এবং ব্যক্তির মর্যাদাকেও অক্ষুণ্ন রাখব। ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার অন্যতম উপায় ধর্মবোধের উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইদিক থেকে সেক্যুলার রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে যাতে ধর্মবোধ সহজ স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া। যে সমাজ অধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সে সমাজ সমূলে বিনষ্ট হবেই – এই হোল শাস্ত্রের বাণী। এখানে ‘ধর্ম’ বলতে আমরা মানুষের ধর্ম বুঝব; কোন সম্প্রদায়গত ধর্মতন্ত্রের কথা বুঝব না। ধর্মশিক্ষার উপর স্বামীজী বিশেষ জোর দিয়েছেন এইজন্য যে, সমাজকে সুস্থ সবল ও সক্রিয় করতে হলে ধর্মশিক্ষা অপরিহার্য। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে মানব শরীরের রক্ত যখন বিশুদ্ধ থাকে, তখন শরীরে রোগের জীবানু প্রবেশ করতে পারে না। ঠিক সেইরকম জাতি হিসাবে ভারতের হৃদপিণ্ডে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তার নাম আধ্যাত্মিকতা। সেই রক্ত যতক্ষণ পবিত্র থাকবে এবং স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হবে ততক্ষণ জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন সুস্থ ও সবল থাকবে।

* * *

মহারাজ অশোকের চেষ্টায় ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। তাঁর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারত থেকে ঐ ধর্মের অবলুপ্তি ঘটে। তখন শৈব, শাক্ত গাণপত্য এবং তান্ত্রিকরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠল। কাপালিকরা নানা রকম ভেল্‌কী দেখিয়ে লোকদের বশীভূত করতে লাগল। এর ফলে বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ম্লান হয়ে পড়ল। ধর্মে এলো অনাচার।

ধর্মে অনাচার ঈশ্বর সইতে পারেন না। তিনি তো বলেছেন,–

‘যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানম্‌ অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌।
পরিত্রানায় হি সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।’

ঈশ্বর পাঠালেন মহাপুরুষকে তাঁর শক্তি দিয়ে। এলেন বৈদান্তিক শ্রীশঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করে প্রায় অবলুপ্ত বেদান্তের ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। তিনি বললেন একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম ছাড়া জগতে যা কিছু দৃশ্যমান বস্তু তা সবই অনিত্য এবং মায়াময় মিথ্যা।

কেরল প্রদেশে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন বিদ্যাধিরাজ। বিদ্যাধিরাজ শিবের ভক্ত ছিলেন। এনার একটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম শিবগুরু। শিবগুরু দর্শন ও মীমাংসা শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন। পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। মহাপণ্ডিতের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

বিয়ের পর অনেকদিন কেটে গেল। নব দম্পতির কোন ছেলেপুলে হল না। তখন শিবগুরু ও তাঁর পত্নী শিবের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা জানালেন পুত্র সন্তান লাভের আশায়। একান্ত ভক্তিভরে নিত্য আরাধনা করতে লাগলেন। তাঁদের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে স্বয়ং শিব ব্রাহ্মণ বেশে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, ‘ওহে শিবগুরু, তুমি সর্বক্ষণ সম্পন্ন অল্পায়ু একমাত্র পুত্র চাও, না গুণহীন দীর্ঘায়ু বহুপুত্র চাও?’ শিবগুরু বললেন, ‘আমি বহুগুণযুক্ত একমাত্র পুত্রই চাই। ব্রাহ্মণ বেশী শিব বললেন, তথাস্তু।

অদৃশ্য হলেন ইষ্ট দেবতা। এর কিছুদিন পরে শিবগুরু একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র লাভ করলেন। জগৎগুরু শঙ্করের বরে পুত্রলাভ করেছেন বলে তার নাম

রাখলেন শঙ্কর। ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। এক বছর বয়স থেকেই শঙ্কর কথা বলতে আরম্ভ করেন। দুবছর বয়সে দ্বিতীয় ভাগ পড়া শেষ করেন।

তিন বছর যখন বয়েস তখন শাস্ত্রজ্ঞ বিধানে তার চূড়াকরণ হয়।এই সময় তাঁর বাবা দেহ রক্ষা করেন। শঙ্করের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন মা তাঁর উপনয়নের ব্যবস্থা করলেন। উপনয়নের পর শঙ্কর গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। পরে দর্শন, বেদান্ত, পূর্বমীমাংসা শিক্ষা করলেন। গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করে শঙ্কর ফিরে এলেন নিজের বাড়ীতে।

একদিন শঙ্করের জননী নদীতে স্নান করতে গিয়ে পড়ে যান। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চেতনা লোপ পেল।

শঙ্কর তখন মায়ের কাছে বসে অচৈতন্য শরীরের ওপর জলসিক্ত পদ্মপাতার বাতাস করতে লাগলেন। তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। পরদিন সকলে দেখল, শঙ্করের বাড়ীর সামনে দিয়ে নদী বয়ে চলেছে।

শঙ্করের অলৌকিক কাজের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কেরলের রাজা রাজশেখর শঙ্করকে এই ব্যাপারে কিছু স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিতে চাইলেন। শঙ্কর তা গ্রহণ করেন নি। তিনি নিজের বাড়ীতে একটি চতুষ্পাঠী বসিয়ে সেখানে বেদান্ত ও দর্শন শিক্ষা দিতে লাগলেন।

শঙ্করের মন সংসারে আসক্ত হয়নি দেখে মায়ের মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। একবার কয়েকজন মনীষী তাঁর বাড়ীতে আসেন।

শঙ্করের মাতা তাঁদের দেখে বললেন, বাবা, আপনারা শঙ্করের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলুন। মনীষীগণ বললেন, আপনার পুত্রের পরমায়ু অতি অল্প। তাই শুনে শঙ্করের মাতা মর্মাহত হলেন। আরও বুঝতে পারলেন, শঙ্কর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করবেন। এইসব কারণে তাঁর মনে শান্তি ছিল না। শঙ্কর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, মা, তুমি আমার জন্য এতটুকু ভেবো না। আমি তোমার অনুমতি ছাড়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করবো না। পুত্রের কাছে পরম আশ্বাস পেয়ে মা শান্ত হলেন।

কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য। যাকে দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন তাকে তাঁর প্রয়োজন। এভাবে সংসারমায়ায় আবদ্ধ হয়ে সে থাকবে এ ইচ্ছা ঈশ্বরের আদৌ ছিল না। তাই ছলেবলে শঙ্করকে সংসার ছাড়া করার উপায় প্রকাশ করলেন।

একদিন শঙ্কর নদীতে স্নান করতে নামলেন। জলে নামার সঙ্গে সঙ্গেই কুমীর এসে তাঁর পাদুটো কামড়ে ধরলো। শঙ্কর তখন চীৎকার করতে লাগলেন

মা–মা। তাঁর এভাবে চীৎকার শুনে গর্ভধারিনী সশরীরে উপস্থিত হলেন। শঙ্কর তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, মা, এই দেখ, কুমীরে আমার পা ধরেছে। যদি তুমি আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি দাও তবে আমি কুমীরের হাত থেকে মুক্ত হতে পারি। মা তখন নিরুপায় হয়ে বললেন, আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করো। শঙ্করের পাদুটো ছেড়ে দিল কুমীর। শঙ্কর আনন্দে হাসতে হাসতে তীরের ওপর উঠে এলেন। পরে জনৈক জ্ঞাতির হাতে মায়ের রক্ষনাবেক্ষণের ভার দিয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

নর্মদাতীরে এসে এক মুনির কাছে দীক্ষা নেন শঙ্কর। এই মুনি শঙ্করকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। এই সময়ে শঙ্করের অলৌকিক যোগক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছে অনেকে। গুরু গোবিন্দ নাথ শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। কুলু কুলু নিনাদে নর্মদা নদী বয়ে চলেছে। ঐ নদীর জলকল্লোলে পাছে গুরুদেবের নিদ্রাভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় শঙ্কর একটি কলসীর মধ্যে নদীর সমস্ত জল ভরে ফেললেন। আর জলকল্লোল শোনা গেল না। গুরুদেব শান্তিতে ঘুমোতে পারলেন।

বারানসী ধামে অবস্থান করছেন শঙ্কর। প্রতিদিন পুণ্যসলিলা গঙ্গার জলে অবগাহন করে বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় বসেন। একদিন সকালে গঙ্গাস্নান করে ফিরছেন। পথের মধ্যে একটি লোককে শুয়ে থাকতে থেকে দেখে শঙ্কর মনে করলেন, লোকটি শূদ্র। স্পর্শ করলে অশুচি হবেন।

তিনি লোকটিকে পথ থেকে সরে যেতে বললেন। বললেন, ওরে চণ্ডাল–কুক্কুর–পথ ছাড়। লোকটি তাঁর কথা শুনে বললে, সে কি! বেদে বলা আছে, আত্মা এক, অনাদি, অদ্বিতীয়, পাপশূন্য, নিরঞ্জন, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। অতএব আপনি কেন কুকুরের আত্মায় ও আপন আত্মায় পার্থক্যবোধ করছেন?

ঐ কথা শোনার পর থেকে শঙ্করের মনে ভাবান্তর এলো। অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হলো। ভাবলেন, চণ্ডাল তো চণ্ডাল নয়। সে যে সাক্ষাৎ শঙ্কর। সেই থেকে শঙ্করের মন থেকে আত্মার পৃথকত্ব লোপ পেল। সকলের মধ্যে এক ঈশ্বরের রূপই নানা ভাবে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

কাশীতে থাকার সময় পদ্মপাদ, চিৎমুখ, আনন্দগিরি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাশীধাম ত্যাগ করে শঙ্কর কুরুক্ষেত্র হয়ে বদ্রিকাশ্রম যাত্রা করলেন। সেখানে থেকে তিনি দশখানি উপনিষদের ভাষ্য এবং গীতা ভাষ্য লেখেন। গীতার ভাষ্য লেখা শেষ হলে তিনি ‘সনৎসুজাতীয়’ ও ‘নৃসিংহ তাপনীয় উপনিষদের’ ব্যাখ্যা করেন। তারপর তাঁর ‘উপনিষদ–সহস্রিকা’ নামে অসংখ্য সদুপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

DON'T COPY

তাঁর ‘বেদান্ত ভাষ্য’ অদ্বৈতবাদীদের কাছে এক পরম আদরের ধন। সশিষ্য বদরিকাশ্রমে বাস করার পর শঙ্কর কাশী ধামে ফিরে এলেন। এই সময় একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে শঙ্করকে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করতে বললেন। এই ব্রাহ্মণ আর কেউ নন, ইনি হলেন স্বয়ং ব্যাসদেব। শঙ্করকে পরীক্ষা করবার জন্যে তিনি এলেন। শঙ্করের মুখে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা শুনে আনন্দিত হন। শঙ্করকে বললেন, আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে জগতে অদ্বৈতবাদ প্রচার কর।

শঙ্কর বললেন, আমার আয়ুষ্কাল মাত্র ষোল বছর। ব্যাসদেব বললেন, আরও ষোল বছর বাড়িয়ে দিলুম। বত্রিশ বছর পর্যন্ত তোমার আয়ু স্থির হলো। অতঃপর শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বের হলেন। মাহিষ্মতি নগরে পন্ডিত মণ্ডন মিশ্র এবং তাঁর স্ত্রী উভয় ভারতীকে পরাস্ত করে তিনি অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠা করলেন। মণ্ডন মিশ্র শঙ্করের কাছে দীক্ষা নিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি স্থানে ঘুরে শঙ্কর সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়কে বিচারে পরাস্ত করে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

এই মত প্রচারের জন্যে তিনি ভারতের চার দিকে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সেগুলি নিম্নরূপঃ

১। দক্ষিণে রামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃঙ্গেরি মঠ।
২। উত্তরে বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ।
৩। পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্রে সারদামঠ।
৪। পূর্বদিকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ।

শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করলেন তার সারমর্ম হচ্ছে,–

১। পরমার্থতঃ সৎপদার্থ একটি। তাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

২। ব্রহ্ম মায়া বা অবিদ্যা নাম্নী একটি শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত। অবিদ্যা দ্বারাই জগতের প্রতীতি হয়।

৩। এই ব্যবহারিক জগৎ কতকগুলি জীবাত্মা এবং তাদের বিষয়ীভূত বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ। এসব জীবের জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় এ দুটোই অসৎ। কেননা তা’ অবিদ্যা পরিকল্পিত।

৪। অজ্ঞান জীব মায়া প্রভাব অতিক্রম করে যথার্থ বস্তুর জ্ঞানলাভ করতে পারে না। কেননা মায়া বস্তুর যাথার্থ্যকে আবরণ করে রেখেছে।

৫। বেদের কর্মকাণ্ড মুক্তি লাভের সহায়তা করতে পারে না। জ্ঞান কাণ্ডের দ্বারাই মুক্তি লাভ করা যায়।

ন্যায়ের সূচনা

সুনন্দন ঘোষ

ন্যাজারেথের যীশু এসেছিলেন ভারতের উত্তর ভূখণ্ডে
সনাতন জ্ঞানের শিখা স্পর্শ করতে,
কপিলাবাস্তুর সিদ্ধার্থ গৌতম বসেছিলেন পূর্বের ভূখণ্ডে
অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে,
দক্ষিণ থেকে প্রদক্ষিণে বেরিয়েছিলেন কালাডির আচার্য শঙ্কর।
আলোকপ্রাপ্ত মানুষেরা উজ্জ্বল করছিলেন মানবতার ভবিষ্যৎ।

ঘোড়ার খুরের আঘাতে আঘাতে তাঁদের চলার পথ মুছে দিয়ে
আড়াই হাজার বছর ধরে উপমহাদেশে হানা দিয়েছে দানবেরা।
পুড়েছে নালন্দা, মাটিতে মিশেছে হাম্পি,
নারী হয়েছে পণ্য, কৃষক হয়েছে ক্রীতদাস,
রক্তে ধুয়েছে পানিপথ, জালালাবাদ, জালিয়ানওয়ালাবাগ।

বড় মধুর এ’ মাটির মায়া,
তাই হানাদারেরা থেকে গেছে -- ছদ্মনামে, ছদ্মবেশে।
সময়ের চাহিদায় বদলেছে প্রকৌশল।
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভিক্ষে দেয় পাঁচশো টাকা,
রাজপাট গিলে নেয় উপেনের দু’বিঘে জমি,
অলক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাড়তে থাকে চালকলে, আবাসনে,
সুইস ব্যাঙ্কে, পার্টি অফিসে।

এত বঞ্চনাতেও ভাঙা যায় না অবাধ্য শিরদাঁড়া।
রোদে জলে অনাহারে মৃতপ্রায়, ব্যাটনের ঘায়ে ফাটছে মাথা,
তবু গোঁ ছাড়ছেনা বাচ্চাগুলো।
ভয় পাচ্ছে না হানাদারদের।

“আদেশ যেখানে অন্যায়, বিশৃঙ্খলাই ন্যায়ের সূচনা”।

* *